মহানায়কের আখ্যান

সোমেশ্বর ভৌমিক

বাংলা সিনেমার ইতিহাসে উত্তমকুমার একটি গুত্বপূর্ণ নাম। স্বাধীনতার পরে প্রায় তিন দশক ধরে বাংলা সিনেমারমূলধার ার সঙ্গে সমার্থক হয়ে ছিলেন এই নায়ক-অভিনেতা। এই সময় বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে বাংলা সিনেমার সফলতার পেছনে সেরা বাজি উত্তমকুমার।---প্রথম প্রদর্শনীর সময়ে তাঁর যেসব ছবি রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে বা অতিত্রম করেছে, সেগুলির সংখ্যা পঁচাত্তর। এর অর্থ, ছবিগুলো একই সঙ্গে তিনটি হলে মুত্তি পেয়েছে এবং সম্মিলিতহিসেব অনুযায়ী ২৫ সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় ধরে চলেছে, একটানা । এছাড়া উত্তমকুমার - অভিনীত দশটি ছবিপ্রথম প্রদর্শনীর সময়ে সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন বা অতিত্রম করেছে। অর্থাৎ ছবিগুলো একই সঙ্গে তিনটি হল মিলিয়ে একটানা চলেছে ৫০ সপ্তাহ বা ত ারও বেশি সময়। তাঁর অভিনীত আরো তিনটি ছবি প্রথম প্রদর্শনীর সময় প্লাটিনাম জয়ন্তী পালন বা অতিত্রম করেছে। অর্থ াৎ এগুলো চলেছে তিনটি হলের হিসেব মিলিয়ে টানা ৭৫ সপ্তাহ বা তারও বেশি। তাছাড়া, তাঁর অভিনীত অধিকাংশ ছবিই বেশ কয়েকবার করে পুনর্মুত্তি পেয়েছে। একটি সূত্র জানাচ্ছে,১৯৬০ -এর দশকে উত্তমকুমার অভিনীত ছবিতে প্রিন্ট -- পাবলিসিটি নিয়ে খরচ হত গড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচলাখ টাকা । (সেই ছবিতে উত্তমকুমারের সঙ্গে সুচিত্রা সেন থ াকলেই খরচ বেড়ে দাঁড়াত গড়ে ছয় থেকে সাড়ে ছয়লাখ টাকা।) এইসব ছবির মধ্যে যেসব ছবি হিট হতো, সেগুলোর ব্যবসা থেকে প্রথম প্রদর্শনীর সময়েই খরচের পাঁচ-ছয় গুণ টাকা উঠে আসত। নমুনা হিসেবে পেশ করা যায় অরবিন্দ মুখে াপাধ্যায় পরিচালিত 'নিশিপদ্ম' (১৯৬৯) ছবির কথা। এ-ছবি তৈরি খরচ, প্রিন্ট -পাবলিসিটি নিয়ে, আড়াই লাখ টাকা। ছবিটি একবারই মাত্র মুত্তি পেয়েছে।সেসময় এ-ছবি তিনটি হলের প্রতিটিতে একটানা ১৭ সপ্তাহ চলেছিল। এই অবকাশে এ-ছবিতে ব্যবসার পরিমাণপনেরো লাখ টাকা আইনগত কারণে ছবিটির আর পুনর্মুত্তি হয় নি।

স্বাধীনতার পরে বাংলা সিনেমার জগৎ যখন বিপর্যস্ত এক উৎপাদনক্ষেত্র আর খণ্ডিত বাজার নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে,এখানক ার কণ অবস্থা দেখে দক্ষ শিল্পী-কলাকুশলীদের দল পা বাড়াচ্ছেন বোম্বাইয়ের পথে, তখনই বাংলা সিনেমায় উত্তমকুম ারের আবির্ভাব । এবং সেই গভীর সঙ্কটের সময়ে উত্তমকে কেন্দ্র করেই বাংলা সিনেমা এক ধরনেরপুনর্জীবন পেল। এই পুনর্জীবনের মূল নির্দেশক হচ্ছে বাণিজ্যিক সাফল্য। অভিনয় - জীবনের শুতে যে- অভিনেতাপেয়েছিলেন 'ফ্লপ মাস্টার জেনারেল' অভিধা, জীবনাবসানের পরে তাঁকেই বলা হয়েছে 'ওয়ান ম্যান ইন্ডাষ্ট্রি'!

এভাবে মূল্যায়নের বদলে জন্ম নিয়েছে অতিরঞ্জন। তাঁর সমসাময়িক শক্তিশালী অভিনেতা -অভিনেত্রীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। সে সময় মূলধারার ছবিতে কাজ করেছেন একদল দক্ষ পরিচালক আর কলাকুশলী। যুক্তির খাতিরে একথা বলতেই হবে উত্তম - অভিনীত ছবির জনপ্রিয়তা আর ব্যবসায়িক সাফল্যের পেছনে তাঁদের অবদানও কম নয়। একথা তো সঙ্গতভ াবে জিজ্ঞেস করা যায় যে, অণকুমার চট্টোপাধ্যায় কি উত্তমকুমার হতে পারতেন যদি না থাকতেন সুচিত্রা সেন, পাহাড়ী স ান্যাল, ছবি বিশ্বাস, বিভুতি লাহা, অজয় কর প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব ? উত্তমকুমারের মহত্ত্ব নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু তাঁর ওপরে অকারণে আরোপ করা হয়েছে এক অনৈতিহাসিক দেবত্ব।উত্তমকমুমার বাংলা সিনেমার জগতে একটি ঘটনা। তবে সে -ঘটনায় আছে এক নিটোল কাঠামো ; তাঁরই অভিনীতঅধিকাংশ ছবির মতো আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত যুক্তিগ্রাহ্য এক পাঠ (text)।

এই পাঠের আদি নিহিত আছে স্বাধীনতার পরে বাংলা সামাজিক বিন্যাসের এক রূপান্তরের মধ্যে। স্বাধীনতার অগে বাংল

া ছবির প্রধান পৃষ্ঠাপোষক ছিলেন শহরবাসী এক ধরনের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এরা শহরবাসী হলেও গ্রাম আর কৃষির সঙ্গে এদের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। স্বাধীনতার লগ্নে এই শ্রেণীর সামাজিক প্রভাব গিয়ে দাঁড়াল শুন্যের কোঠায়। এদের বিকল্প হিসেবে পাওয়া গেল যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে উৎসুক এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী । এদের পুরোভাগে ছিল যুদ্ধের বাজারে নানারকম দালাল আর অবৈধ ব্যবসায়ে দুপয়সার মুখ দেখা নাগরিক মানুষের দল এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এই বাংলারই গ্রামাঞ্চল থেকে শহর চলে - আসা অন্তঃঅভিবাসীরা। গ্রামাঞ্চলেরস্বচ্ছল পরিবারের সন্তান, শিক্ষিত মানুষ এরা---শহরে স্থায়ী জীবিকা আর স্থায়ি আস্তানার প্রত্যাশী। শহরবাসী এই মধ্যবিত্তের দলকে আরো ভারি করেছে পুর্ববাংলা থেকে ছিন্নমূল হয়ে চলে -আসা মানুষের ভীড় যাদের একটা বড়ো অংশই মধ্যবিত্ত। অর্থাৎ স্বাধীনতার লগ্নে এক ধাক্কায় বাঙালি সমাজের প্রধান চালিকাশক্তির আসন দখল করল দ্রুতউত্থানশীল এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আর যুক্তিবাদ এদের আকর্ষণ করেছিল। আধুনিক সংস্থা / সংগঠন আর সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি তারা ছিল অনুরক্ত। তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি সম্পর্কেও ছিল ভীষণ সচেতন। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে অত্যুৎসাহী। এই সব বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেই তৈরি হতে থাকে স্বাধীনতা -- উত্তর বাংলা সিনেমার সাংস্কৃতিক প্রকল্প---- মধ্যবিত্তশ্রেণী সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আর মনস্তাত্ত্বিকউত্থানের পাঁচালী। স্বাধীনতার পরে জাতীয়তাবাদের নতুন প্রকল্প তৈরি হয়েছিল আত্মনির্ভর জাতি (nation) আর শক্তিশালী রাষ্ট্র (state) গঠনের ঘোষিত লক্ষ্য সামনে রেখে, বাংলা সিনেমার সাংস্কৃতিক প্রকল্পটি তারই অংশ। সীমাবদ্ধ এক পরিসরে জাতির (race অর্থে) বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান।

প্রভাবশালী সামাজিক শক্তি হিসেবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর উত্থান, 'আধুনিক' ব্যবস্থার প্রতি তাদের পক্ষপাত, পুরনোকে বর্জন করার মানসিকতা, সামাজিক বৈষম্য নির্মূল করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ, সামাজিক ন্যায়ের প্রতি তাদের নিষ্ঠা---এইসব উপাদানের রূপায়ণ বাংলা সিনেমার শরীরে এক নতুন মাত্রা এনে দিল। দেশ, সমাজ, পরিবার,দাম্পত্য---এইরকম নানা প্রেক্ষিতে নতুন যুগের নতুন মানুষের সমস্যা বিচারের জন্য বেশ কিছু ছক তৈরি হল এইসময়কার সিনেমায়। বাংলা সিনেমায়। এইসব ছকের মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়াল মেলোড্রামা--যাতে পাওয়া যায় কণরসাশ্রিত আবেগের নিঃসরণ। ১৯৫০ -এর দশকে প্রথমে কয়েকটি বছরের বাংলা ছবিতে এই নতুন ধরনের ইঙ্গিতটুকু ছিল। তখনো প্রমথেশ বড়ুয়া আর নিউ থিয়েটার্সের অভিজাত প্রভাব বাংলা সিনেমায় প্রবল। অন্যদিকে সম্ভাব্য নতুন ধারার উৎপাদনগুলিও ঠিকমতো চিহ্নিত নয় তখনো । স্পষ্ট নয় নতুন ধারার গড়পড়তা ছবির বিষয় আর মেজাজের সঙ্গে মানানসই অভিনেতার আদল। নতুন প্রকল্পের জন্যে দরকার ছিল নতুন মুখ -ও। ১৯৫০ -এর দশকের মাঝামাঝি সেই চাহিদার উত্তর হয়ে এলেন উত্তমকুমার।

এরপর পুরো ষাটের দশক জুড়ে উত্তমকুমার বাংলা সিনেমার জগতে বিরাজ করেছেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো। সময়টাও লক্ষ্য করার মতো। স্বাধীনতার সময়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষি আর কৃষি-নির্ভর শিল্পের প্রাধান্য ছিল। সেসময় যে -কোনো 'আধুনিক' অর্থনীতির পক্ষে এটাকে একধরনের দুর্বলতা হিসেবে ভাবা হতো। এমনও প্রধান কারণ এদেশের অর্থনীতির কৃষিনির্ভরতা। প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৫১-৫৬, ১৯৫৬-৬১) সাহায্যে এই দুর্বলতা ঘোচানোর একটা জমি তৈরি করার চেষ্টা হল সেই ১৯৫০ -এর দশকে। শু হল ভারতীয় অর্থনীতিতে শিল্পক্ষেত্রের গুত্ব বাড়ানোর আয়োজন। ভাবা হল, উন্নয়নের পথ দেখাবে যন্ত্রশিল্প আর ভারি শিল্প । রাষ্ট্র তথা সরকারি মহল এই ভাবনার শুধু উৎসই ছিল না, সেটিকে রূপায়িত করার কাজেও নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এল। 'উন্নয়নের অর্থনীতি'-র এই তত্ত্ব সমাজজীবনে এক ধরনের গতির সঞ্চার করেছিল। কিছু ওলটপালট -ও হল। বাংলা সমাজেওগতির সঞ্চার প্রভাব পড়ল। বিশেষ করে এখনকার শহুরে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ এই ঘটনার সুফল ভোগ করতেশু করেছিল। সরকারি উদ্যোগে যন্ত্রশিল্প আর ভারি শিল্প তৈরির প্রাথমিক ঝোঁকটা যেসব অঞ্চলে পড়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল পশ্চিম বাংলা। ফলেএখানে দেখা গেছে শিল্পায়নের আর নগরায়ণের দ্রুত বিস্তার। সিনেমারব্যবসা জমে ওঠার পক্ষে পরিবেশটা যথেষ্ট অনুকুল। এরই সঙ্গে মনে রাখতে হবে পুববাংলা ছেড়ে এদেশে চলে -আসা ছিন্নমূল মানুষের কথা। এঁরাও বসতিস্থাপন করেছেন উপনগরী তৈরি করে। ফলে বাজার হারানোর ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার তাগিদে এসব অঞ্চলের গড়পড়তা দর্শকের

কাছে বাংলা সিনেমার আখ্যান সরে এল গ্রাম থেকে শহরের বুকে। গ্রামকেন্দ্রিক আখ্যান, কৃষিজীবী অভিজাত সমাজের ছবি (হোক্ না তাদের কেউ কেউ শহরবাসী) দেখা গেছে নিউ থিয়েটার্সের দাপটের যুগে। কিন্তু মূলধারার নতুন বাংলা সিনেমার অধিকাংশ আখ্যানই শহরকেন্দ্রিক। অন্য আর-এক প্রবণতাও দাপটে তখন বিনোদনই হয়ে উঠছে পরম ব্রহ্ম। হিন্দি ছবির মোকাবিলায় বাংলা সিনেমাকেও খুঁজতে হয়েছে বিনোদনের পথ, অবশ্যই নিজের ধরনে। সেই পথের খোঁজে বাংলা সিনেমাকেও সরে আসতে হলতার একান্ত সাহিত্যনির্ভরতার পথ ছেড়ে । এই পথ নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল ১৯৩০ -এর দশকেই, নিউ থিয়েটার্সের তৈরি করা ছকে । কিন্তু স্বাধীনতার পরে, বিশেষ করে ১৯৫০ -এর দশকে এসে বোঝা গেল, সিনেমায় সাহিত্যের উপস্থাপনা এক ধরনের আভিজাত্যের বা সঙ্কীর্ণতার তাৎপর্য নিয়ে আসে। সাহিত্যনির্ভর সিনেমা যেন বলতে থাকে, এঠিক সবার জন্য নয়---শুধু রসিকের আস্বাদনের বস্তু। কিন্তু ১৯৫০ -এর দশকে সিনেমা খুঁজছে আমজনতাকে । এই অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াতেই উত্তমকুমারের উত্থান। ক্রমে এই অভিনেতার প্রবল উপস্থিতি সাহিত্যনির্ভরতার দায় থেকেবাংলা সিনেমাকে মুক্ত করে দেয় অন্যএক নির্ভরযোগ্য ভিত্তিভূমি।

উত্তমকুমারকে ভেবেই তখন তৈরি করা হয়েছে সিনেমার জন্য গল্প, লেখা হয়েছে চিত্রনাট্য । সেখানে উত্তমের আনখশির প্রতিটি শারীরিক উপাদানকে ব্যবহার করার চেষ্টা হয়েছে বাণিজ্যের স্বার্থে, বিনোদনের স্বার্থে ---তাঁর সুন্দর মুখশ্রী, সরল চাহনি, উজ্জ্বল হাসি, ভরাট কণ্ঠস্বর, সটান চেহারা, আকর্ষণীয় চালচলন, অভিব্যক্তির ব্যাপ্তি আর বৈচিত্র্য, স-ব। ছবির পর্দায় এই মানুষটি কখনো পাশের বাড়ির ছেলেটি, কখনো বা কেতাদুরস্ত ব্যক্তিত্ব ; কখনোপ্রবল ভূস্বামী, সফল শিল্পপতি বা কোনো রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী ; কখনো দুরন্ত প্রেমিক, কখনো বা দরদী স্বামী। উদাহরণ আরো বাড়ানো যায়। কিন্তু দরকার নেই । আসল কথা হল, সেই সময় (১৯৬০-এর দশকে) গড়পড়তাবাঙালি নিজেকে ঠিক যে-যে ভূমিকায় কল্পনা করেছে, যা - যা তার কাছে বাঞ্ছনীয় বা কাম্য মনে হয়েছে, সেসবেরই রূপায়ণ দেখা গেছে উত্তমকুমার অভিনীত বিভিন্ন চরিত্রে। এ হল এক ধরনের ইচ্ছাপুরণ---সমবেত অবচেতনের বাস্তব রূপায়ণ বা প্রতিফলন। একেই তো আধুনিক তাত্ত্বিকরা বলেন সাংস্কৃতিক নির্মাণ। স্বভাবতই এই নির্মাণের প্রক্রিয়ায় এসে পড়ে অতিরঞ্জনের ঝোঁক। কাল্পনিক একটি আধারে নানা ধরনের প্রত্যাশা আর আবেগের যোগফলেপ্রায়ই তৈরির হয় বাস্তব-অতিক্রমী একটি চরিত্র। উত্তমকুমার অভিনীত অধিকাংশ চরিত্রই এরকম । পরের - পর এই ধরনের চরিত্রে অভিনয়ের সুবাদে উত্তমকুমারের ব্যক্তিত্বেও আরোপিত হয়েছিল জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা । ১৯৬০ -এর দশকে উত্তমকুমার যে মহানায়কে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তার পেছনে নিঃসন্দেহে কাজ করেছে এই আহরিত অতিমানবতা।

কিন্তু এই দশকের শেষে আর্থ - সামাজিক পরিবেশের আমূল পরিবর্তন দেখা গেল। ১৯৬১-৬৬ সালব্যাপী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলো নানা অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সঙ্কটের চাপে বিপর্যস্ত হল। ১৯৬২ সালেচীনের সঙ্গে আর ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারকের দের অন্য ভাবে চিন্তা-ভাবনা শু করতে হল। অগ্রাধিকারের প্রশ্নে যন্ত্রশিল্প, ভারি শিল্প ইত্যাদি 'উন্নয়নমুখী' কার্যকলাপ পেছনে পড়ে গেল।'প্রতিরক্ষা' সরঞ্জাম নির্মাণের ওপর সবচেয়ে বেশি গুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। এমনকি এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করারজন্য তৃতীয় পরিকল্পানার শেষে তিন বছরের জন্য থামিয়েই দেওয়া হল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রথ। সরকারেরনজর এবার পুরোপুরি নিবদ্ধ হল প্রতিরক্ষা শিল্পে, যে -শিল্পের কোনো প্রত্যক্ষ সামাজিক অর্থনৈতিক প্রভাব নেই। এর ফলে অর্থনীতিতে এল ভাটার টান--- অর্থনীতির পরিভাষায় থাকে বলে মন্দা । এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রতিফলন ঘটেছে ভারতীয় সমাজে। পশ্চিমবাংলার সমাজও এই প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল না। শিল্পক্ষেত্রে তৈরি হওয়া এই সমস্যার প্রতিফলন দেখা গেছে কারখানা থেকে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক আর নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধিতে । স্থানীয় পর্যায়ে এখানে আরো যোগ হল কৃষি উৎপাদনে সঙ্কটের
কারণে খাদ্যশস্যের অভাব এবং পুববাংলা থেকে আসা শরণার্থীদের নিয়মিত চাপ। সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা আর নির্ভরতার বদলে দেখা দিল ক্রোধ, উদ্বেগ, শঠতা, স্বার্থপরতা, এমনকি হিংস্রতা।

এইরকম এক জটিল সামাজিক অবস্থায় উত্তমকুমার অভিনীত সাবেক ছাঁচের চরিত্রগুলো তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারালো।

উত্তমের চেহারা সুলভ কিছু গুণ তাঁকে মহানায়কে পরিণত করেছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্য এক ধরনের সমবেত অবচেতনের প্রতিফলনের পক্ষে সেইসব গুণাবলী শুধু যে যথেষ্ট ছিল না তা-ই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে সেগুলি বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে দ্বন্দ্বও তৈরি করেছে। উত্তমকে ঘিরে ১৯৬০ -এর দশকে মেলোড্রামার বন্যা বয়ে গিয়েছে। কিন্তু মেলোড্রামার সেই পেলব ভঙ্গি আর কণ্ঠ সুর ১৯৭০ -এর দশকে এসে দর্শকমনে তেমন করে আলোড়ন তুলতে পারেনি। চরিত্রায়ণের যেসব ছাঁদ উত্তমের জন্য তৈরি হয়েছিল ১৯৬০ -এর দশকে, সেগুলো অচল অথবা বাতিল হয়ে গেল ১৯৭০ -এর দশকে।

অন্য ধরনের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে উত্তম তাঁর অভিনয় প্রতিভার প্রমাণ রেখেছেন এই দশকে। কিন্তু সাংস্কৃতিক নির্মানের যে প্রক্রিয়াটি তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, তার পিছনটা থেকে উনি কখনোই মুক্ত হতে পারেন নি। অন্যভাবে বললে, এই পিছুটান থেকে দর্শকরাই মুক্তি দেন নি তাঁকে। তাঁর মনোমোহিনী হাসি প্রেমিকসুলভ ব্যবহার আর পরিশীলিত আচার-আচরণের বাইরে যে থাকতে পারে অভিনয়ের আরো নানা প্রদেশ, অভিব্যক্তির স্তর---এই সম্ভাবনাকে কখনোই সর্বতোভাবে গ্রহণ করেননি বাংলা সিনেমার গড়পড়তা দর্শক। বলা ভালো, উত্তমকুমারের 'গুণগ্রাহী'র দল। 'অগ্নিপরীক্ষা', 'সাগরিকা' বা 'শাপমোচন'--এর সূত্র ঘিরে, তারই চর্বিতচর্বণে আাদিত হয়েছে, তৃপ্ত থেকেছে বাংলা ছবির গড়পড়তা দর্শক। ফলে সেই নির্মাণকে সমৃদ্ধ পুষ্ট করেছে 'সাহেব বিবি গোলাম' ,'মায়ামৃগ','শঙ্খবেলা', 'নায়িকা সংবাদ', 'সপ্তপদী', 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' বা 'আনন্দ আশ্রম'--এর মতো ছবি এমনকি যে-ছবিকরতে করতে তাঁর মৃত্যু হল, সেই ছবি 'ওগো বধু সুন্দরী'--তেও সেই নির্মাণেরই ছায়া। রোমান্টিক হিরোর এই আদলটাই উত্তমকুমারের আদরণীয়, জনপ্রিয় সত্তা। নিছক ব্যতিত্রম হিসেবেই গণ্য হয় 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'নায়ক','চিড়িয়াখানা', 'যদুবংশ', 'থানা থেকে আসছি' বা 'জতুগৃহ'--র মতো ছবিতে উত্তমকুমার অভিনীত চরিত্রগুলি। এগুলো যেন তাঁর নায়কসত্তার 'অপর'--- এক ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চল। এগুলোকে ঘিরে গড়ে ওঠে আবেগের প্রবল ঢেউ 'সোনার খাঁচা' বেঁধে ফেলে, বন্দী করে ফেলে মহানায়ককের মহানায়কের সত্তায় বিলীন হয়ে যান শক্তিশালী এই অভিনেতা।

বি.দ্র. উত্তমকুমার অভিনীত বিভিন্ন ছবি কীরকম ব্যবসা করেছে, সে বিষয়ে কিছু তথ্য আমি ব্যবহার করেছি প্রবন্ধের প্রথমদিকে। তথ্যগুলো সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র।